সঙ্কটের সূত্রপাত হরজেগোভিনায়। তুর্কী রাজকর্মচারী সেখানে নির্মমভাবে কর আদায় করত। হারজেগোভিনার উৎপীড়িত কৃষকরা শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বহু রাজকর্মচারীকে হত্যা করে। প্রত্যুত্তরে তুর্কী সেনারা নির্বিচারে খ্রিস্টান প্রজাদের হত্যা করে। এবারে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বুলগেরিয়াতে। বুলগেরিয়রা কিছু তুর্কীকে হত্যা করলে তুর্কী সেনারা বুলগেরিয়ায় বীভৎস হত্যাকাণ্ড শুরু করে দেয়। কেবল একটি এলাকায় আশিটি গ্রামের মধ্যে পনেরোটি বাদে সব গ্রাম ধ্বংস করা হয়। বাটক শহরে আচমেত পাশা নামে এক রাজকর্মচারী প্রথমে শহরে অধিবাসীদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলে। অস্ত্র সমর্পণ করলে তাদের টাকাকড়ি দিয়ে দিতে বলা হয়। অর্থ সমর্পণ করা হলে নিরীহ শহরবাসীদের নির্বিচারে হত্যা শুরু হয়। হাজার খানেক খ্রিষ্টান এক সুরক্ষিত গীর্জায় আশ্রয় নিয়েছিল। তুর্কী সেনারা গীর্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পেরে গীর্জার ছাদের টালি উপড়ে ফেলে পেট্রল ভেজানো ন্যাকড়ায় আগুন জ্বালিয়ে আশ্রিতদের গায়ে ছুঁড়ে মারে। গীর্জার আশ্রিত স্ত্রী-পুরুষ শিশু সকলেই মারা যায়।

বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডের উদারনৈতিক নেতা গ্লাডস্টোন দাবি করলেন এবার তুরস্ককে তল্পিতল্পাসহ ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে হবে। কিছুদিন বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তৎপরতা দেখা গেলেও কোন সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো বুলগেরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে রুশ তুরস্ক যুদ্ধের (১৮৭৬-৭৭) সূত্রপাত। প্লেভনা নামক স্থানে তুর্কী সেনাপতি ওসমান পাশা অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে রুশ বাহিনীকে রুখে দেয়। শেষ পর্যন্ত প্লেভনার পতন হলে রুশ সৈন্য দ্রুত এগিয়ে গিয়ে এড্রিয়ানোপল দখল করে এবং কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বাধ্য হয়ে সুলতান শান্তির প্রস্তাব দেন। সানস্টিফানোর সন্ধিতে রুশ তুরস্ক যুদ্ধের অবসান হয় (১৮৭৮)।

সানস্টিফানোর চুক্তিতে তুরস্ক রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতা মেনে নেয়। উত্তরে রুমানিয়া, দক্ষিণে গ্রীস এবং পশ্চিমে সার্বিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে বুলগেরিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বুলগেরিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হবে বলে স্থির হয়। রাশিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে কারস্ বার্টুম প্রভৃতি স্থান দখল করেছিল। তাছাড়া সে ডব্রুপার বিনিময়ে রুমানিয়ার কাছ থেকে সেই সব অংশ ফিরে পাবার প্রস্তাব করেছিল, যা সে ১৮৫৬ সালে প্যারিসের চুক্তিতে হারিয়েছিল। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ওপর রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সানস্টিফানোর চুক্তিতে বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তুরস্কের পতন অনিবার্য মনে হয়। এই অবস্থায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি প্রতিবাদের ঝড় তোলে। তারা দাবি করে প্রাচ্য সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা আন্তর্জাতিক বৈঠকেই মতৈক্যের ভিত্তিতে ঐ সমস্যার সমাধান করতে হবে। শেষ পর্যন্ত বিসমার্কের নেতৃত্বে বার্লিন বৈঠকে ঐ সমস্যার পুনর্বিবেচনা শুরু করে।

বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও রুমানিয়াকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করা হয়। তবে বসনিয়া ও হারজেগোভিনার শাসন অধিকার অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবং সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর সংযোগস্থল নোভিবাজারের সঞ্জাকে সৈন্য মোতায়েনের অধিকারও অস্ট্রিয়া পায়। বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করে দক্ষিণের ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, ম্যাসিডনের উত্তরে পূর্ব রুমেলিয়াকে তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করা হয় এবং বাকি অংশে স্বাধীন বুলগেরিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। রুমানিয়া রাশিয়াকে ডব্রুজার বিনিময়ে বেসারাবিয়া ছেড়ে দেয়। তুরস্ক ভবিষ্যতে গ্রীসকে থেসালি এবং ফ্রান্সকে টিউনিসিয়া অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইংলন্ড সাইপ্রাস দ্বীপ লাভ করে। কনস্ট্যান্টিনোপল ও আড্রিয়ানোপল সংলগ্ন ভূভাগ এবং ম্যাসিডোনিয়া ফিরে পাওয়ায় তুরস্ক ইউরোপে নবজীবন লাভ করল।

বার্লিন চুক্তি বলকান জাতিগুলির কাউকে খুশি করতে পারেনি। অস্ট্রিয়া কর্তৃক বসনিয়া ও হারজেগোভিনা দখল এবং নেভিবাজারে সৈন্য মোতায়েন ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ সার্বিয়া জাতিরাষ্ট্র গঠনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। রুমানিয়া রাশিয়াকে অনুর্বর ডব্রুজার পরিবর্তে বেসারাবিয়া ছেড়ে দেওয়া মেনে নিতে পারেনি। সবচেয়ে ক্ষুদ্র হয়েছিল বুলগেরিয়া সানস্টিফানোর সন্ধিতে গঠিত বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত করে মাত্র একভাগকে স্বাধীনতা দেওয়ায়। গ্রীস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া সকলেই নিজ নিজ রাজ্য সংলগ্ন ম্যাসিডোনিয়ার অংশ বিশেষ লাভ করতে চেয়েছিল। এখন ম্যাসিডোনিয়ায় তুরস্ক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকলেই বিক্ষুব্ধ হল। এইভাবে বার্লিন চুক্তি বলকান সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন বলেছেন যে বার্লিন কংগ্রেসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হল এই যে তা প্রত্যেক দেশকে অসন্তুষ্ট রাখল এবং প্রত্যেক দেশই আগের থেকে অনেক বেশি উত্তেজনার মধ্যে রইল। ১৮৭৮ সালে ব্রিটেন ডার্ডানেলসে একটি নৌবহর প্রেরণ করেছিল একথা বোঝানোর জন্য যে তুরস্কে বা তার চারপাশে তার স্বার্থ জড়িয়ে আছে। একথা বুঝেও তুরস্কের কিছু করার ছিল না। তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাঙনের ফল হয়েছিল এই যে রাশিয়া আর ইংল্যান্ড তাদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা নিয়ে পূর্ব ইউরোপে এবং এশিয়াতে প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী কখনোই চায়নি যে অটোম্যান সাম্রাজ্য ভেঙে যাক। কিন্তু অটোম্যান সাম্রাজ্যকে অটুট রাখার লক্ষ্যেও সে ব্যর্থ হল। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী 'সম্মানের সঙ্গে শান্তি'র যে লক্ষ্যের কথা আগে ঘোষণা করেছিলেন তা পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। রাশিয়া বেসারাবিয়া এবং অস্ট্রিয়া বসনিয়া ও হারজেগোভিনা লাভ করেও সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। বরং এইভাবে বলকান অঞ্চলকে ভাগ করার ফলে বৃহত্তর স্লাভ রাষ্ট্রের কথা যারা ভাবত তাদের মধ্যে আঘাত দেওয়া হয়েছিল। ডেভিড টমসন স্পষ্ট করেই বলেছেন যে ভবিষ্যতে বুলগেরিয়া বলকান অঞ্চলের ঝটিকা কেন্দ্র হয়ে রইল। সার্বিকভাবে বলকান জাতীয়তাবাদের সমস্ত বিপজ্জনক ধারার একটিও প্রশমিত হল না। এখন ইউরোপের শক্তিসাম্যের ধারক হয়ে দাঁড়াল ব্রিটেনও নয়, রাশিয়াও নয়—জার্মানি—অর্থাৎ এমন দেশ যার নিজের ভেতর অস্থিরতা কম ছিল না। এরপর এক প্রজন্মকাল ইউরোপে একটা আপাত শান্তির বাতাবরণ ছিল কিন্তু সে শান্তি ছিল অনিশ্চিত। মাঝে মাঝেই ইউরোপ যুদ্ধ ও সংকটের মধ্য দিয়ে প্যারিসের শান্তি দিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত যখন একটা বড় যুদ্ধের ভেতর দিয়ে গিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর বাদে ইউরোপে আবার একটা কংগ্রেসের অধিবেশন বসল তখন সে অধিবেশন বার্লিনে বসেনি, বসেছিল প্যারিসে। ততদিনে বলকান জাতীয়তাবাদের সমস্যা তার ভিন্নতর সমাধান খুঁজে পেয়েছিল।

(ঙ) বলকান যুদ্ধের পটভূমিকা

বার্লিন চুক্তি (১৮৭৮) বলকান সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তির পরের দশকগুলিতে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। সমস্যা জটিলতর হওয়ার প্রধান কারণ বলকান জাতিগুলির অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ ও ক্রম বর্ধমান জাতীয় আন্দোলন।

বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও গ্রীস সকলেরই দাবি ছিল ম্যাসিডনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ওপর। তুরস্কের কাছ থেকে ম্যাসিডন পুনরুদ্ধার করে জাতীয় স্বার্থ কিছুটা চরিতার্থ করা সম্ভব ছিল। ফলে তুরস্কের সঙ্গে আবার সংঘাতের সম্ভাবনা বেড়েই চলে।

রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকায় বুলগেরিয়ায় রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাশিয়ার রাণীর সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে ঘনিষ্ঠ আলেকজান্ডার ব্যাটেনবার্গ বুলগেরিয়ার রাজা নির্বাচিত হন। বুলগেরিয়া শাসনে সহায়তা করার জন্য বহু রাশিয়ান কর্মচারি নিযুক্ত হয়। কিন্তু আলেকজান্ডার নিজে ছিলেন রুশ বিদ্বেষী। রুশ কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারেও বুলগেরিয়রা রুশ বিরোধী হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ সালে পূর্ব রুমেলিয়া আলেকজান্ডারকে তাদের রাজ্য নির্বাচিত করে এবং পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। এই অবস্থায় রাশিয়া আলেকজান্ডারকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

কিছুদিন পর আলেকজান্ডার মুক্তি পেলেও এবং রাজপদে পুনর্বহাল হলেও পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে জার্মানির স্যাক্স-কোবুর্গ-গোথা রাজ পরিবারের সদস্য প্রিন্স ফার্ডিনান্ডকে রাজা নির্বাচিত করা হয়। ধীরে ধীরে বুলগেরিয়া রাশিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন নীতি গ্রহণ করে।

বার্লিন চুক্তিতে সার্বিয়া সার্ব অধ্যুষিত ম্যাসিডনের রাজ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। অস্ট্রিয়া কর্তৃক বসনিয়া হারজেগোভিনা অধিগ্রহণ এবং সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর সংযোগস্থল নোভিবাজারে অস্ট্রিয়ার সৈন্য মোতায়েন বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ সার্বরাষ্ট্র গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া আলবেনিয়া তুরস্কের অধীনে থাকায় সার্বিয়ার জলপথে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের পথ রুদ্ধ হয়েছিল। ফলে সার্বিয়া অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। বুলগেরিয়া ও রুমেলিয়া ঐক্যবদ্ধ হলে বুলগেরিয়ার প্রতিও সার্বিয়া ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে।

গ্রীস অনেক আগে স্বাধীনতা পেলেও (১৮৩০) তার সীমানা সঙ্কুচিত করে রাখা হয়েছিল। গ্রীস মনে করত আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ক্রীট, থেসালি, এপিরাস ও ম্যাসিডোনিয়ার অংশবিশেষ গ্রীক সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চল বলে তার প্রাপ্য। ১৮৮১ সালে তুরস্ক গ্রীসকে থেসালি ও এপিরাসের একাংশ প্রদান করে। কিন্তু গ্রীসের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা এতে তৃপ্ত হয়নি।

রুমানিয়া রাশিয়ার কাছ থেকে বেসারাবিয়া ফিরে পাবার জন্য এবং অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যভুক্ত ট্রানসিলভানিয়া ও বুকোভিনা এবং বুলগেরিয়ার উত্তর অঞ্চলে রুমেনিয় অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে বৃহত্তর রুমানিয়া জাতি রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। এইভাবে বিক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদ ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছিল।

বলকান সমস্যা জটিলতর হওয়ার আর একটি কারণ তুরস্কে তরুণ-তুর্কী আন্দোলন। তুরস্ক সুলতানের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী বহু তুর্কী দেশ ছেড়ে বিদেশে, বিশেষ করে ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রবাসী তুর্কীরা বিদেশে বসেই বিপ্লবের ছক কষে। তারা দেশে ফিরে গিয়ে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও সংবিধান রচনার জন্য সুলতানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ফলে সুলতানের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তুরস্ক সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। এদিকে তুরস্কে বিশৃঙ্খলার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী-বসনিয়া-হারজেগোভিনা পুরোপুরি দখল করে নেয়। বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ক্রীটের অধিবাসীরা গ্রীসের সঙ্গে তাদের সংযুক্তি ঘোষণা করে। ঘটনাগুলি সবই বার্লিন চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু ইউরোপের কোন বৃহৎ শক্তিই হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসে নি। বরং জার্মানি ও ইটালি অস্ট্রিয়ার বসনিয়া হারজেগোভিনা দখলকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। সার্বিয়া প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়, ভবিষ্যতে বৃহৎ সার্বিয়া গঠনের স্বপ্ন ভেঙে পড়ে। সব মিলিয়ে বলকান অঞ্চলে আবার সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে আসে।

বলকান যুদ্ধের পটভূমি হিসাবে আর যে ঘটনার উল্লেখ করতে হয় সেটি হচ্ছে বৃহৎ শক্তিগুলির পরিবর্তিত নীতি। বার্লিন চুক্তির পর বিশেষভাবে বুলগেরিয়ায় তার প্রভাবের অবসান হলে রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের পরিবর্তে এশিয়ার সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করে। জার্মানি তার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বসবাসের জন্য এবং পুঁজি বিনিয়োগের জন্য 'পুবের দিকে এগিয়ে চলো' (Drang nach Osten) নীতি নিয়ে দ্রুত তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে। ১৯০৮ সালে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম নিজে কন্সটান্টিনোপল পরিভ্রমণ করে সুলতানের সঙ্গে মৈত্রী দৃঢ় করেন। এই অবস্থায় ইংলন্ডের রাশিয়া ভীতি দূর হয় এবং রাশিয়ার সঙ্গে সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলে মিত্রতা স্থাপন করে (১৯০৭)। একই সঙ্গে ইংলন্ড বুলগেরিয়ার জাতীয় আন্দোলনের প্রতিও সহানুভূতিশীল হয়।

(চ) প্রথম বলকান যুদ্ধ

তুরস্কে তরুণ তুর্কী আন্দোলন ব্যর্থ হলে (১৯০৮) এবং তুরস্কের সরকার প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে চলে গেলে অমুসলমান প্রজাদের ওপর আগের মতই উৎপীড়ন শুরু হল। এই অবস্থায় সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া ও গ্রীস একতাবদ্ধ হয়ে বলকান লীগ গঠন করে। ম্যাসিডোনিয়ায় তুরস্কের কঠোর নীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বলকান লীগের সদস্যগণ তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিকভাবে অগ্রসর হয়ে প্রথম বলকান যুদ্ধের সূচনা করে (১৯১২)। যুদ্ধে তুরস্ক প্রতিটি বলকান রাষ্ট্রের হাতে পরাজিত হয়। মন্টিনিগ্রো যুদ্ধ শুরু করে। গ্রীস ম্যাসিডোনিয়া প্রবেশ করে সালোনিকা (Salonica) দখল করে। সার্বিয়া তুরস্ককে পরাজিত করে আলবেনিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সবচেয়ে চমকপ্রদ সাফল্য পায় বুলগেরিয়া। সে তুরস্ককে পরাজিত করে কন্সন্টিট্যানোপলে-এর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তুরস্কের যুদ্ধের থেকে অব্যাহতি ও শান্তি কামনা করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। অবশেষে লন্ডন চুক্তি দ্বারা প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান হয় (১৯১৩)। এই চুক্তিতে তুরস্ক ইউরোপ থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়। কেবলমাত্র থ্রেস (Thrace) -এর কিছু অংশে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। গ্রীস ক্রীট লাভ করে। আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

(ছ) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

প্রথম বলকান যুদ্ধে বলকান লীগের সদস্যরা তাদের সাধারণ শত্রু তুরস্কের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তুরস্কের সহজ পরাজয় তাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করে এবং তারা বিজিত রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিবাদ শুরু করে।

চারিদিকে স্থলভাগ বেষ্টিত সার্বিয়া চেয়েছিল আলবেনিয়ার মধ্য দিয়ে এড্রিয়াটিক উপসাগরে প্রবেশ করতে। কিন্তু আলবেনিয়াকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করায় সার্বিয়া হতাশ হয়। সে এখন ম্যাসিডোনিয়ায় আরও বেশি এলাকা দাবি করে। তুরস্কের বিরুদ্ধে সহজ জয়ে বুলগেরিয়া তার ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। সে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও গ্রীসের দাবিকে অগ্রাহ্য করে সমগ্র ম্যাসিডোনিয়া গ্রাস করে এবং সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু হয়। রুমানিয়া, গ্রীস ও মন্টিনিগ্রো বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। সুযোগ বুঝে তুরস্ক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করে। এইভাবে যুগপৎ পাঁচটি রাজ্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বুলগেরিয়া সহজেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অবশেষে রুমানিয়ার চেষ্টায় বুখারেস্টের সন্ধির দ্বারা (১৯১৩) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। বুখারেস্টের সন্ধিতে ম্যাসিডোনিয়ার বৃহত্তর অংশ বণ্টিত হল গ্রীস ও সার্বিয়ার মধ্যে। তাছাড়া গ্রীস পায় ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ, রুমানিয়া পায় দক্ষিণ ডব্রুজার অংশ বিশেষ। নোভিবাজার সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

বুখারেস্টের সন্ধি বলকান সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার দূরত্ব বেড়ে চলে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বসনিয়া-হারজেগোভিনা দখল করায় ঐক্যবদ্ধ সার্ব জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পথে বড় বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। অস্ট্রয়া-হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার সংঘাত ইউরোপে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাতে জার্মানি এগিয়ে আসে, অন্যদিকে সার্বিয়াকে উস্কানি দেয় রাশিয়া। পরাজিত, অপমানিত ও ক্ষুব্ধ বুলগেরিয়া প্রতিশোধের বাসনায় ধীরে ধীরে জার্মানি ও তুরস্কের ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এইভাবে ইউরোপে বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বলকান জাতির পারস্পরিক বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

২.২.৪ বলকান জাতীয় জাগরণ ও জাতিরাষ্ট্র গঠন

অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ও সে ভাঙ্গন নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলির আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও চক্রান্ত বলকান জাতীয়তাবাদের অন্তরালে প্ররোচনা ও প্রেরণা দুই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তুরস্ক সমেত সমস্ত বলকান রাজ্যগুলির নিজস্ব গঠন ও বিকাশ। উনিশ শতকে তুরস্ক রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হলেও

অর্থনৈতিক দিক থেকে ততটা দুর্বল ছিল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পেও এগিয়ে চলেছিল। আবার বলকান জাতিরাষ্ট্র গঠনের পিছনেও একটা বড় প্রেরণা ছিল সমৃদ্ধতর ভবিষ্যৎ রচনার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা কিভাবে চরিতার্থ হয়েছিল তা বোঝানোর জন্য নীচে বলকান অঞ্চলে জাতিরাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হল।

(ক) সার্বিয়া

বলকান জাতিগুলির মধ্যে সার্বিয়াই তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। শূকর পালক কারা জর্জের সফল আন্দোলন (১৮০৪ থেকে ১৮১৩) প্রধানত অত্যাচারী স্থানীয় জানিসারির (তুরস্কের বাছাই সৈন্য) বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। ১৮১৩ সালে তুরস্ক সার্বিয়া পুনর্দখল করে। কারা জর্জ হাঙ্গেরীতে পালিয়ে যান। সেখানে সহকর্মী মিলোশ ওব্রোনেভিকের ষড়যন্ত্রে কারা জর্জ নিহত হন। ওব্রোনোভিক সার্বিয়ায় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাশিয়ার চাপে সুলতান ওব্রোনোভিক সার্বিয়ায় পাশা বলে মেনে নেয়। সার্বিয়া স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পায়।

সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে সার্বিয়ার জাতীয় জাগরণ শুরু হয় ১৮২০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে। সার্বিয়ানরা অতীত গৌরবের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। প্রাচীন ইতিহাস, লোকগাথা সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারাদজিক (Vuk Karadzic) নামক একজন লেখক সার্বিয়ায় ভাষা ও ব্যাকরণের সংস্কার করেন এবং ঐ ভাষার অভিধান রচনা করেন। সার্বিয়ানরা সার্ব অধ্যুষিত বসনিয়া, হারজেগোভিনা, মন্টিনিগ্রো ও সার্বিয়াকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতিরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখে।

কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সার্বিয়া ছিল অনগ্রসর। সমুদ্রে প্রবেশপথ না থাকায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। যাতায়াতের জন্য অস্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ডানিয়ুব নদীর ওপর তাকে নির্ভর করতে হত। ১৮৭৭ -৭৮ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের পর সার্বিয়া স্বাধীনতা পেলেও তাকে পার্শ্ববর্তী সার্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা সমুদ্র উপকূলে পৌঁছানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে উনিশ শতকের শেষে সার্ব জাতীয়তাবাদ বলকান জাতিগুলির মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে। তাদের অসন্তোষ এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বড় কারণ।

(খ) গ্রীস

সার্বিয়া প্রথম স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেলেও গ্রীসই প্রথম স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। গ্রীসে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয় আঠারো শতকের শেষে ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে।

গ্রীসের প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষা তখন কেবলমাত্র যাজক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভাষার বিকৃতরূপ ও নানা ভাষা থেকে গৃহীত শব্দযোগে সাধারণের ভাষা তৈরি হয়েছিল। আঠারো শতকের শেষে বিখ্যাত সাহিত্যিক আডামানটিওস কোরেস (Adamantios Koraes) ও রীগাস ফেরাইওস (Rhigas Pheraios) প্রাচীন গ্রীক ভাষার সঙ্গে আধুনিক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গ্রীক ভাষার পুনর্জাগরণ ঘটান। ভাষা সংস্কারের ফলে গ্রীকরা তাদের ধ্রুপদী সাহিত্যের গ্রন্থরাজি পাঠ করতে সক্ষম হয়। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে গ্রীকদের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা এমনি গর্ব বোধ করতে থাকে যে এখন থেকে তারা নিজেদের আর রোমান (Romans) না বলে হেলেনীজ (Hellenes) বলা শুরু করে।

সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের সঙ্গে যুক্ত হয় ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী প্রভাব। কোরেস ও রীগাস ফরাসী জাতীয়তাবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রীগাস স্পেন জার্মানি বা ইটালির গুপ্ত সমিতির অনুকরণে অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে

তোলেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীকদের জাতীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। ১৭৯৮ সালে রীগাস তুর্কী শাসকদের হাতে শহীদ হন।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে ফিলিকে হেটাইরিয়া (Philike Hetairia —অর্থ Association of Friends) নামে অন্য একটি গুপ্ত সমিতি। আলেকজান্ডার ইপ্সিলান্টির নেতৃত্বে ক্রিমিয়া দ্বীপে গ্রীক বণিকদের দ্বারা ফিলিকে হেটাইরিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮১৪)। ১৮১৪-২০ সালের মধ্যে ফিলিকে দ্রুত অটোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষিত ও পদস্থ গ্রীকদের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। ১৮২০ সালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল আশি হাজার । গ্রীকদের সঙ্গে ধর্মীয় মিল থাকায় রুশরা বিপুলভাবে হেটাইরিয়া ফিলিকেকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। চারদিক থেকে অর্থ আসে এবং ঐ অর্থ দিয়ে অস্ত্র কিনে গোপনে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি চলে।

গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে ১৮২১ সালে। এই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ছয় বছরে গ্রীকরা এককভাবে সংগ্রাম করে। উভয়পক্ষই এই পর্যায়ে নৃশংস বর্বরতার পরিচয় দেয়। মিশরের শাসনকর্তা মেহমেত আলি তুরস্কের পক্ষে হস্তক্ষেপ করলে স্বাধীনতা সংগ্রামের পট পরিবর্তন হয়। মিশরীয় সেনারা মোরিয়া দ্বীপের মিসলঙ্ঘির (Missoonglu) সব গ্রীকদের হত্যা করলে ইউরোপে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান গ্রীসের প্রতি ইউরোপীয়রা গভীর সহানুভূতি দেখাতে এগিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই ফ্রান্স, ইংলন্ড, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সংগ্রামী গ্রীকদের সমর্থনে সমিতি (Phihellenic Society) গঠিত হয়েছিল। নানা দেশ থেকে অর্থ, অস্ত্র এবং যুদ্ধ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী আসতে শুরু করে। ইংরেজ কবি বাইরন নিজে যুদ্ধে যোগ দিতে এসে প্রাণত্যাগ করেন। ফ্রান্সে লাফায়েৎ, স্যাটোব্রিয়াঁ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গ্রীকদের সমর্থনে অর্থ, অস্ত্র সরবরাহ করে পাঠাতে থাকেন। ইংলন্ডের ব্যাঙ্ক মালিকরা গ্রীক বণিকদের অনেক অর্থ ধার দিয়েছিল। ইংলণ্ডের স্বার্থ ছিল গ্রীকদের রক্ষা করা। এই অবস্থায় ইংলন্ড, ফ্রান্স রাশিয়ার মধ্যে লন্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তুরস্ককে গ্রীসের স্বাধীনতা মেনে নিতে বলা হয়। তুরস্ক ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে ফ্রান্স ও ইংলন্ডের নৌবহর তুর্কী-মিশরীয় নৌবহরকে নাভারিনোর (Navarino) নৌযুদ্ধে ধ্বংস করে। এই যুদ্ধ ফ্রান্স ও ইংলন্ডের অনভিপ্রেত ছিল, তারা তুরস্কের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে এবং থমকে যায়। রাশিয়া এককভাবে হস্তক্ষেপ করে। রাশিয়া যুদ্ধে ক্রমাগত জয়লাভ করতে থাকে ও অ্যাড্রিয়ানোপল পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তুরস্ক বাধ্য হয়ে শান্তির প্রস্তাব দেয়। লন্ডন চুক্তিতে (১৮২৯) ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও তুরস্ক মিলিতভাবে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় ও গ্রীসের সঙ্কুচিত সীমানা নির্ধারিত করে দেয়। গ্রীকরা স্বভাবতই তাদের সঙ্কুচিত সীমানায় সন্তুষ্ট হতে পারে নি।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ব্যাভেরিয়া রাজকুমার গ্রীসের রাজা মনোনীত হন। তিনি ১৮৩৩ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে গ্রীসকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য তিনি অপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং প্রজা বিদ্রোহে সিংহাসন হারান। তাঁর স্থলে নতুন রাজা নির্বাচিত হন একজন দিনেমার (Danish) রাজকুমার। তিনি সংবিধানের শাসন প্রবর্তন করেন। ইংলন্ড ১৮৬৪ সালে গ্রীসকে আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ (Ionian Islands) ফিরিয়ে দেয়। ১৮১৫ সাল থেকে ঐ দ্বীপপুঞ্জ ইংলন্ডের অধীনে ছিল। বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) গ্রীসের সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য তুরস্কের ওপর চাপ দেওয়া হয়। তুরস্ক অনিচ্ছা সত্ত্বে ১৮৮১ সালে গ্রীসকে থেসালি ফিরিয়ে দেয়। তরুণ তুর্কী বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলার সুযোগে গ্রীস ক্রীট জয় করে (১৯০৮)। গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডোনিয়ায় বহু গ্রীক বাস করত। ঐ অংশের ওপর গ্রীসের দাবি ছিল। প্রথম বলকান যুদ্ধে (১৯১২) গ্রীসের দাবি না মানা হলে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে (১৯১৩) গ্রীস বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং যুদ্ধশেষে বুখারেস্টের সন্ধিতে (১৯১৩) ম্যাসিডনের অংশ বিশেষ এবং ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ লাভ করে। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে গ্রীসে প্রায় সত্তর লক্ষ অধিবাসীর সংযোজন হয়।

(খ) রুমানিয়া

দানিয়ুব অঞ্চলের দুটি প্রদেশ মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া (এদের Danibian Principaliities বলা হত) নিয়ে গঠিত রুমানিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। প্রদেশ দুটির ওপর বরাবর অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। রাশিয়া সুযোগ পেলেই প্রদেশ দুটি-আংশিক বা সম্পূর্ণ দখল করে নিত। পরে ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। এখানে তুরস্কের নিয়ন্ত্রণ ছিল সামান্যই।

এখানেও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে রুমানিয়ার জাতীয় ইতিহাস রচিত হয়। রোমান্টিক সাহিত্য রচনা করেন গ্রিগোর আলেকজান্দ্রেস্কু (Gregore Alexandrescu) রুমানিয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ শুরু হয়েছিল সতেরো শতকে। উনিশ শতকে তা সম্পূর্ণ হয়। এখানকার অধিবাসীরা ছিল রোমান ক্যাথলিক, গ্রীক ক্যাথলিক অথবা ইহুদী ধর্মাবলম্বী। রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে রুমানিয় জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করত। কিন্তু অচিরেই এই আন্দোলন রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলে যায়। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রুমানিয় জাতীয় আন্দোলনের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রুমানিয়ার স্বাধীনতার পথে বড় বাধা ছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাশিয়া প্রদেশ দুটি দখল করে নেয়। কিন্তু পরে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ডানিয়ুবের মোহনায় বেসারাবিয়ার ওপর রাশিয়ার লোভ ছিল। প্যারিসের সন্ধিতে (১৮৫৬) মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দুটি তুরস্কের সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। ১৮৫৯ সালে দুটি প্রদেশের অধিবাসীই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রদেশ দুটির সংযুক্তি ঘটিয়ে অখণ্ড রুমানিয়া রাজ্য গঠন করে। আলেকজান্ডার কুজা (Alexander Cuza) নামে একজন সেনানায়ককে সম্মিলিত রাজ্যের রাজা নির্বাচিত করা হয়। বুখারেষ্টে রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ সালে গণ আন্দোলনের ফলে কুজা পদচ্যুত হত। তাঁর স্থলে রাজা হিসাবে নির্বাচিত হন জার্মানির হোহেনজোলার্ন রাজবংশের ক্যারল নামে জনৈক ব্যক্তি। বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) রুমানিয়াকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু রাশিয়া উর্বর বেসারাবিয়া দখল করে এবং বিনিময়ে রুমানিয়াকে অনুর্বর ডব্রুজা অঞ্চল ছেড়ে দেয়। রুমানিয়া দুই বলকান যুদ্ধে যোগদান করে ডব্রুজা অঞ্চলের সীমানা সামান্য বাড়াতে পেরেছিল।

রাজা ক্যারল চার্লস উপাধি নিয়ে রুমানিয়ায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। তিনি প্রাশিয়ার অনুকরণে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। রুমানিয়ার রেলপথ স্থাপিত হয়, রাস্তাঘাটের উন্নতি করা হয় এবং ভূমি সংস্কারে হাত দেওয়া হয়। অন্য বলকান রাজ্যগুলির তুলনায় রুমানিয়া ব্যাবসা বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি করে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পনেরো লক্ষ) জমির ওপর চাপ পড়তে থাকে। ফলে প্রজারা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহী হয়ে উঠত। ১৯০৭ সালে এই রকম একটি বিদ্রোহ দমন করতে লক্ষাধিক সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছিল। বিদ্রোহের পর কৃষকদের দুর্দশা লাঘব করা জন্য নানা পদক্ষেপও নেওয়া হয়।

(ঘ) বুলগেরিয়া

বলকান জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ প্রথম বুলগেরিয়াতে হলেও বুলগেরিয়া সবশেষে স্বাধীনতা লাভ করে। জাতীয় জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যাজক সম্প্রদায়। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রী ফাদার পেইজি (Father Paisy) বুলগেরিয়ার ইতিহাস (Slavo Bulgarian History) রচনা করেন। এই বইএ বুলগেরিয়দের বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বুলগেরিয়ায় প্রথম আধুনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কয়েক দশকের মধ্যে সারাদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দু হাজার। বুলগেরিয় ভাষায় অভিধান প্রকাশ করেন গেরভ (N. Gerov) । প্রাচীন ইতিহাস, কবিতা, লোকগাথার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হতে থাকে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়গুলি সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ১৮৭০ সালে বুলগেরিয়ার গ্রীক চার্চ ইস্তানবুলের গ্রীক চার্চ থেকে পৃথক হয়ে যায়। বুলগেরিয় চার্চের পৃথক অস্তিত্ব গ্রীসের গোঁড়া খ্রিস্টানদের ক্ষুব্ধ করে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বুলগেরিয়দের লক্ষ্য ছিল ওব্রেনোভিকের নেতৃত্বে সার্বিয়া যেমন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেয়েছিল ঐরূপ অধিকার অর্জন করা। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবেনি। স্বাধীনতার দাবী দানা বাঁধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর। রাশিয়া এই আন্দোলনের সমর্থন জানায়। তুরস্ক ভেবেছিল বুলগেরিয়ার পৃথক চার্চ বলকান অঞ্চলে বুলগেরিয় ও অন্য জাতিগুলির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবে। তাই পরোক্ষে তুরস্ক ও বুলগেরিয় স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্ধন যোগায়।

১৮৭৬-১৮৭৭ সালে বুলগেরিয় হত্যাকাণ্ডের সময় রাশিয়া ছাড়া অন্য কোন বৃহৎ রাষ্ট্র বুলগেরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। রাশিয়াই এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তুরস্ককে পরাজিত করে সানস্টিফানোর সন্ধিতে স্বাধীন বৃহৎ বুলগেরিয়া গঠন করে। বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) বুলগেরিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত করে মাত্র এক ভাগকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। বাকী দুভাগের মধ্যে পূর্ব রুমেলিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় আর ম্যাসিডন তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই কৃত্রিম বিভাগ বুলগেরিয়া মেনে নিতে পারেনি।

রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের (১৮৭৭-৭৮) পর থেকেই বুলগেরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। রুশ কর্মচারীরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বুলগেরিয়া শাসনে সাহায্য করে। রুশ-সাম্রাজ্ঞীর আত্মীয় জার্মানির ব্যাটেনবার্গের রাজকুমার আলেকজান্ডার বুলগেরিয়ার রাজা নির্বাচিত হন। কিন্তু আলেকজান্ডার ছিলেন রুশ বিরোধী। রুশ কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারেও বুলগেরিয়দের রুশ বিরোধী করে তোলে। ১৮৮৫ সালে পূর্ব রুমেলিয়া বুলগেরিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির দাবি করলে আলেকজান্ডার সেই দাবি মেনে নেন। পূর্ব রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। এদিকে রুশ বিরোধী নীতির জন্য আলেকজান্ডার বুলগেরিয়ার সিংহাসন হারান। তাঁর স্থলে নির্বাচিত হন স্যাকস-কোবুর্গ-গোথার রাজকুমার ফার্ডিনান্ড। বুলগেরিয়া বলকানলীগ গঠন করে প্রথম বলকান যুদ্ধে তুরস্ককে সম্পূর্ণ পরাজিত করে এবং বলকান অঞ্চলকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। কিন্তু যুদ্ধের পর অধিকৃত স্থানের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে বুলগেরিয়া অন্য বলকান রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরাজিত হলে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে ম্যাসিডন বিভাজিত হয়। পরাজিত ক্ষুব্ধ বুলগেরিয়া প্রতিশোধের জন্য ধীরে ধীরে তুরস্ক, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সঙ্গে মিত্রতার নীতি গ্রহণ করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেয়।

২.২.৫ সারাংশ

ফরাসী বিপ্লবের পরোক্ষ ফল হিসাবে উনিশ শতকে পৃথক ভাষা ও জাতির ভিত্তিতে পৃথক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের দাবি ওঠে। বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও এই ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আগে সব দেশেই সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটে। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, লোকগাথা প্রভৃতির আলোচনার মাধ্যমে লোকে অতীতের দিকে মন ফেরায়। জাতীয় গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতিরাষ্ট্র গঠনের পিছনে আর একটি তাগিদ ছিল—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। বলকান অঞ্চলের জাতিগুলি মনে করত পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হলে তারা সমৃদ্ধতর ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারবে। ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থে বলকান জাতীয়তাবাদকে কখনও ইন্ধন যুগিয়েছে, কখনও প্রতিরোধ করেছে। ইংল্যান্ডের রুশভীতি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর তুরস্ক প্রীতি বলকান সমস্যাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের ক্রয় ক্ষয়িষ্ণুতা যেমন বলকান রাজ্যগুলির সামনে অনেক সুযোগ এনে দিয়েছিল সেইরকম বলকান রাজ্যগুলির নিজেদের ঈর্ষা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বও তাদের নানাভাবে দুর্বল করে রেখেছিল। স্বাধীনতা অর্জনের সময় বলকান রাষ্ট্রগুলি সঙ্কুচিত সীমানা পায়। পরে বিভিন্ন সঙ্কটে তাদের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে সীমানা হয় পুরস্কারস্বরূপ বাড়ানো হয়েছে নতুবা শাস্তিস্বরূপ কমানো হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কোন বলকান রাষ্ট্রই সন্তুষ্ট ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের পরে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

২.২.৬অনুশীলনী

১। বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
২। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্ণনা দিন।
৩। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৭৭-৭৮) কেন ঘটেছিল?
৪। বার্লিন চুক্তি (১৮৭৮) কি বলকান জাতিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পেরেছিল?
৫। প্রথম বলকান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করুন।
৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বুলগেরিয়ার সঙ্গে অন্যান্য বলকান জাতির বিরোধের কারণ কি?
৭। বলকান জাতীয় জাগরণে রাশিয়ার ভূমিকা আলোচনা করুন।
৮। বৃহৎ সার্ব রাষ্ট্রগঠনে অস্ট্রিয়া কিভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল?
৯। রুমানিয়া রাষ্ট্রটি কি ভাবে গঠিত হয়েছিল?
১০। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়া কেন অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেয়?

২.২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। J.A.R Marriot—The Eastern Question (1930)
২। Seton Watson—The Rise of Nationality in the Balkans.
৩। David Thomson—Europe Since Napoleon (1965)
৪। C.D.Hazen—Europe Since 1815 (1923)
৫। W. Miler—The Ottoman Expire And Its Successors (1936)
৬। A. J. P. Taylor —The Struggle For Mastery in Europe 1848-1918 (1954)
৭। E. Lipson—Europe in the 19th & 20th Century.
৮। সমর কুমার মল্লিক—*নবরূপে ইউরোপ, ১৮৪৮-১৯১৯* (২০০২)
৯। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী—*য়োরোপের ইতিহাস* (১৯৮৩)।